বিবাদ সৃষ্টিকারী ছয়টি গুণাহ্ থেকে সাবধান!

লেখাঃ মুহাম্মাদ আবু আখতার
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

ইসলাম ভালোবাসা ও সম্প্রীতির ধর্ম। যেসব কাজ মানুষের পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্প্রীতি নষ্ট করে ইসলামে সেসব কাজ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমান যুগে প্রতিনিয়তই মানুষের পরস্পরের মাঝে মনোমালিন্য ও ঝগড়া-বিবাদ বেড়েই চলছে। এর পেছনে ছয়টি জঘন্য পাপকাজের বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা রয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালা এ ছয়টি জঘন্য পাপকাজ থেকে নিষেধাজ্ঞারোপ করে ইরশাদ করেনঃ

“হে ঈমানদারগণ! কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না। আর একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাদের মন্দ নামে ডাকা গোনাহ। যারা এসব কাজ থেকে তাওবা করে না তারাই যালেম।

হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাকো। নিশ্চয় কিছু ধারণা গুণাহ। তোমরা কারো গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না। আর তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।” (সুরা হুজুরাতঃ আয়াত নং ১১-১২)

মহান আল্লাহ তায়ালা উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টিকারী যে ছয়টি জঘন্য পাপকাজ থেকে নিষেধ করেছেন সেগুলো সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

(১) ঠাট্টা-বিদ্রূপ/উপহাস করা

আয়াতে প্রথম নিষিদ্ধ বিষয় হচ্ছে কারো সাথে ঠাট্টা- বিদ্রূপ/উপহাস করা। এর পরিচয় দিতে গিয়ে ইমাম কুরতুবী (রহ) বলেন, কোন ব্যক্তিকে হেয় ও অপমান করার জন্য তার দোষ এমনভাবে উল্লেখ করা যাতে শ্রোতারা হাসতে থাকে। এটা যেমন মুখে সম্পন্ন হয় তেমনি হাত, পা ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা ব্যঙ্গ ও ইঙ্গিতের মাধ্যমেও হতে পারে। কেউ কেউ বলেন, ঠাট্টা-বিদ্রূপ এমন হাসি ও বিদ্রূপকে বলে যা দ্বারা অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয় এবং তার অন্তরে ব্যথা দান করা হয়। ইহা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। কিন্তু কারো অন্তরকে খুশি করার জন্য যে হাসি তামাশা করা হয় তাকে কৌতুক বলা হয়। মিথ্যা ও ধোঁকা না থাকার শর্তে কাউকে খুশি করার উদ্দেশ্যে তার সাথে কৌতুক করা বৈধ। কেননা অনেক সহীহ হাদীসে সাহাবীগণের সাথে নবীজী (সা) এর সত্য কৌতুকের বেশ কিছু ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কুরআন পাক এত গুরুত্ব সহকারে উপহাস নিষিদ্ধ করেছে যে, এ ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীকে পৃথকভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। এখানে 'কওম' শব্দটি পুরুষদের জন্যই ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ অভিধানে এ শব্দটি পুরুষদের জন্য নির্ধারিত, যদিও রূপকভাবে নারীদেরকেও শামিল করে। একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, কুরআনে পুরুষ পুরুষকে এবং নারী নারীকে উপহাস করা ও তা হারাম হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ কোন পুরুষ নারীকে এবং কোন নারী পুরুষকে উপহাস করলে তাও হারাম। কিন্তু একথা উল্লেখ না করে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নারী ও পুরুষের মেলামেশাই শরীয়তে নিষিদ্ধ। মেলামেশা না হলে উপহাসের প্রশ্নই আসে না। আয়াতের পরবর্তী অংশে যা বলা হয়েছে তার সারমর্ম এই যে, কোন ব্যক্তির কথায়-কাজে, আকার-আকৃতিতে অথবা গঠনপ্রকৃতিতে কোন দোষত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে তা নিয়ে কারো হাসাহাসি বা উপহাস করা উচিত নয়। কেননা, তার জানা নাই এ ব্যক্তি সততা, আন্তরিকতা ইত্যাদির কারণে আল্লাহর কাছে তার চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ হতে পারে।

(২) কাউকে দোষারোপ/ গালিগালাজ করা

আয়াতে দ্বিতীয় নিষিদ্ধ বিষয় হচ্ছে কাউকে দোষারোপ/গালিগালাজ করা। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা যা বলেছেন তার আক্ষরিক অর্থঃ "তোমরা নিজেদেরকে দোষারোপ করো না।" তাফসীরে কাবীর প্রণেতা ইমাম রাযী (রহ) এর তিনটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। যথাঃ

ক) কোন মুসলমান তার অপর মুসলমান ভাইকে গালমন্দ বা তিরস্কার করার অর্থ হলো নিজেকে তিরস্কার ও গালমন্দ করা। কেননা দু'জনই একটি দেহের মতো।

খ) একজন যদি অপরজনকে গালমন্দ করে তাহলে অপরজন প্রতিশোধ হিসেবে তাকে গালমন্দ করবে। কাজেই কাউকে গালাগালি করার অর্থ নিজেকেই গালাগালি করা।

গ) অপরকে গালমন্দ করলে (সে যদি এর যোগ্য না হয় তাহলে) উক্ত গালমন্দের অশুভ পরিণাম গালমন্দকারীর দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। সুতরাং এটা যেন নিজেকেই গালমন্দ করা হলো।

কাউকে দোষারোপ/গালিগালাজ করার দ্বারা ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হয়। এর ফলে সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা ব্যাহত হয়। কোন মুসলমানকে গালি দেয়া কবীরা গোনাহ। যাকে গালি দেয়া হয় তার কাছ হতে ক্ষমা চাওয়া ব্যতিত এ পাপ মার্জনা করা হয় না। তবে সাক্ষাৎ অসম্ভব হলে আন্তরিকভাবে তাওবা করতে হবে এবং ঐ ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে। তাহলে এ অসীলায় আল্লাহর কাছে এ পাপ থেকে ক্ষমার আশা করা যায়।

(৩) কাউকে খারাপ নামে/উপাধিতে ডাকা

আয়াতে তৃতীয় নিষিদ্ধ বিষয় হচ্ছে কাউকে খারাপ নামে/উপাধিতে ডাকা। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তোমরা একে অপরকে মন্দ উপাধিতে ডেকো না।" এর তাফসীরে আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (রহ.) বলেন, তোমরা একে অপরকে এমন উপাধিতে ডেকো না যা সে অপছন্দ করে। যেমনঃ কাউকে 'হে ফাসিক', 'হে কাফির' ইত্যাদি বলে সম্বোধন করা।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, কেউ কোন গুণাহ অথবা মন্দকাজ করে তাওবা করার পরও তাকে সেই মন্দকাজের নামে ডাকা এ আয়াতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমনঃ যে ব্যক্তি শিরক, কুফর, চুরি, যেনা, শরাব ইত্যাদি থেকে তাওবা করে নেয় তাকে তার অতীত কুকর্মের জন্য লজ্জা দেয়া ও হেয় করা হারাম। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (সা) বলেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে এমন গোনাহের দ্বারা

লজ্জা দেয় যা থেকে সে তাওবা করেছে তাকে সেই গোনাহে লিপ্ত করে ইহকাল ও পরকালে লাঞ্ছিত করার দায়িত্ব আল্লাহ গ্রহণ করেন।” (কুরতুবী)

(৪) কারো প্রতি কুধারণা পোষণ করা

আয়াতে চতুর্থ নিষিদ্ধ বিষয় হচ্ছে কারো প্রতি কুধারণা পোষণ করা। ইমাম কুরতুবী (রহ) বলেন, “ধারণা বলতে এখানে অপবাদ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির প্রতি শক্তিশালী প্রমাণ ব্যতিত কোন দোষ অথবা গুণাহ আরোপ করা।”

পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদ ও মনোমালিন্য সৃষ্টিতে কুধারণার প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। এর দ্বারা এক দল অন্য দলের ব্যাপারে, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির ব্যাপারে এমন ভ্রান্ত ধারণা ও ভুল বুঝাবুঝিতে নিপতিত হয় যে, ভালো ধারণার কোনো রাস্তাই আর খোলা থাকে না। কুধারণার ফলে বিরোধীদের যেকোন কথা ও কাজকেই নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। বিরোধীদের কথা ভালো ব্যাখ্যার যদি হাজারো অবকাশ থাকে, অন্যদিকে মন্দ ব্যাখ্যার অবকাশ থাকে একটি তাহলেও মন্দ দিকটা তার কাছে বিরাট হয়ে দেখা দেয়। আর এ মন্দ দিকটাকেই সে সন্দেহাতীত ও নিশ্চিত বলে ধরে নেয়। এর অজুহাতেই তার উপর দোষারোপ করে বিষেদাগার শুরু করে। ফলে ঝগড়া বিবাদ ও মনোমালিন্য ক্রমে বাড়তেই থাকে। আয়াতে কিছু ধারণা পাপ বলতে কুধারণাকেই বুঝানো হয়েছে এবং ইহা থেকে দুরে থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৫) কারো দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করা

আয়াতে পঞ্চম নিষিদ্ধ বিষয় হচ্ছে কারো দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করা। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, “তোমরা কারো দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করো না।” এর মমার্থ হচ্ছে, লোকদের গোপন তত্ত্ব ও তথ্য খুঁজে বেড়াইও না। একজন অপরজনের দোষ-ত্রুটি তালাশ কর না। অন্যদের অবস্থাবলি ও কাজকর্মের দোষ ধরার লক্ষে ওঁৎ পেতে থেকো না। এরূপ কাজ খারাপ ধারণার বশবর্তী হয়ে করা হোক বা কারো ক্ষতি করার জন্য করা করা হোক অথবা নিছক কৌতুক করার উদ্দেশ্যে হোক সর্বাবস্থায়ই নিষিদ্ধ।

বয়ানুল কুরআনে আছে, "গোপনে অথবা নিদ্রার ভান করে কারো গোপন কথা শোনাও নিষিদ্ধ। তবে যদি ক্ষতির আশংকা থাকে কিংবা নিজের অথবা অন্য মুসলমানের হেফাজতের উদ্দেশ্য থাকে তবে ক্ষতিকারীর গোপন ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধি অনুসন্ধান করা জায়েয।"

(৬) গীবত করা

আয়াতে ষষ্ঠ নিষিদ্ধ বিষয় হচ্ছে কারো গীবত করা। গীবতের সবচেয়ে উত্তম ও বাস্তবসম্মত পরিচয় দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিম্নোক্ত হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'গীবত কাকে বলে, তোমরা কি তা জান?'

সাহাবিগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই ভালো জানেন। তিনি বললেন, তোমার কোনো ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলা, যা সে অপছন্দ করে, তা-ই গীবত। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি যে দোষের কথা বলি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে তাহলেও কি গীবত হবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যে দোষের কথা বল, তা যদি তোমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে তবে তুমি অবশ্যই তার গীবত করলে। আর তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে না থাকে তবে তুমি তার ওপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছ। (মুসলিম)

সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, কোনো ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে অন্যের কাছে তার এমন দোষের কথা বলা গীবত যা সে অপছন্দ করে।

গীবত ইসলামি শরিয়তে হারাম ও কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। গীবতের জঘন্যতা বুঝানোর জন্য আল্লাহ তায়ালা গীবত করাকে মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করার সমতুল্য বলেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তোমরা একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো ইহা ঘৃণাই কর।"

গীবতের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

‘ধ্বংস তাদের জন্য, যারা অগ্র-পশ্চাতে দোষ বলে বেড়ায়।’ (সূরা হুমাজাহঃ ১)

কেউ গীবত শুনলে তার অনুপস্থিত ভাইয়ের পক্ষ থেকে তা প্রতিরোধ করা কর্তব্য। আর যদি প্রতিরোধের শক্তি না থাকে তবে তা শ্রবণ থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা, ইচ্ছাকৃতভাবে গীবত শোনা নিজে গীবত করার মতোই অপরাধ।

এ সম্পর্কে হাদিসে বর্ণিত আছে, সাহাবি মায়মুন (রা) বলেন, ‘ একদিন স্বপ্নে দেখলাম এক সঙ্গী ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে আছে এবং এক ব্যক্তি আমাকে তা ভক্ষণ করতে বলছে। আমি বললাম, আমি একে কেন ভক্ষণ করব? সে বলল, কারণ তুমি অমুক ব্যক্তির সঙ্গী গোলামের গীবত করেছ। আমি বললাম, আল্লাহর কসম আমি তো তার সম্পর্কে কখনো কোনো ভালোমন্দ কথা বলিনি। সে বলল, হ্যাঁ, এ কথা ঠিক। কিন্তু তুমি তার গীবত শুনেছ এবং সম্মত রয়েছ।’

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মিরাজের সময় আমাকে এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো যাদের নখ ছিল তামার। তারা তাদের মুখমণ্ডল ও দেহ আঁচড়াচ্ছিল। আমি জিবরীল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? তিনি বললেন, এরা নিজ ভাইদের গীবত করত ও ইজ্জতহানি করত। (তাফসীরে মাজহারি)

আবু সায়িদ ও জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ গীবত ব্যাভিচারের চেয়েও মারাত্মক গুণাহ। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, এটা কিভাবে? তিনি বললেন, ব্যক্তি ব্যভিচার করার পর তওবা করলে তার গুণাহ মাফ হয়ে যায়। কিন্তু যে গীবত করে তার গোনাহ আক্রান্ত প্রতিপক্ষের ক্ষমা না করা পর্যন্ত মাফ হয় না।’

সুতরাং এ কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হল যে, গীবত একটি জঘন্য পাপাচার। এ থেকে সবাইকে সতর্কতার সাথে বিরত থাকতে হবে।

তাফসীরে রুহুল মা’আনিতে বলা হয়েছে, ছয়টি কারণে গীবত করা জায়েজ আছে। যথা-

১- জুলুম থেকে নিজে বাঁচতে, অন্যকে বাঁচাতে। এমন ব্যক্তির কাছে গীবত করতে পারবে, যে একে প্রতিহত করতে পারবে।

২- খারাপ কাজ বন্ধ করার জন্য সাহায্য চাইতে এমন ব্যক্তির কাছে গীবত করতে পারবে যে তা বন্ধ করার ক্ষমতা রাখে।

৩- বিষয়টি সম্পর্কে শরয়ী সমাধান জানতে গীবত করে মূল বিষয় উপস্থাপন করা জায়েজ আছে। যেমন বলা যে, ' আমাকে অমুক ব্যক্তি আমার উপর জুলুম করেছে, তাই আমারও কি তাকে আঘাত করা জায়েজ আছে?'

৪- সাধারণ মুসলমানদের দ্বীনী ও দুনিয়াবী ধোঁকা ও খারাবী থেকে বাঁচাতে গীবত করা জায়েজ। যেমন সাক্ষ্য সম্পর্কে, হাদীস, আসার ও ইতিহাস বর্ণনাকারী সম্পর্কে, লেখক, বক্তা ইত্যাদি সম্পর্কে দোষ জনসম্মুখে বলে দেয়া, যেন তার ধোঁকা ও মিথ্যাচার থেকে মানুষ বাঁচতে পারে।

৫- প্রকাশ্যে যদি কেউ শরীয়তগর্হিত কাজ করে, তাহলে তার খারাবী বর্ণনা করা এমন ব্যক্তির কাছে যারা এর দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া থেকে বাঁচতে পারে। যেমন কেউ প্রকাশ্যে মদ খায়, তাহলে মানুষের সামনে তার সরাসরি বদনাম করা জায়েজ আছে। যেন এমন খারাপ কাজ করতে ভবিষ্যতে কেউ সাহস না করে।

৬- কারো পরিচয় প্রকাশ করতে। যেমন কেউ কানা। তার পরিচয় দেয়া দরকার। কিন্তু নাম কেউ চিনতেছে না। কিন্তু কানা বলতেই সবাই চিনে ফেলে। তখন কানা বলা বাহ্যিক দৃষ্টিতে গীবত হলেও এটা বলা জায়েজ আছে। এতে গীবতের গোনাহ হবে না। {তাফসীরে রুহুল মাআনী- ১৪/২৪২, সূরা হুজুরাত-১২}

উল্লেখিত ছয়টি পাপকাজ আমাদের সমাজে মহামারীর আকার ধারণ করেছে। কেউ যখন এ জঘন্য পাপগুলো করার একটু সুযোগ পায় সে সুযোগকে খুব কম লোকই হাতছাড়া করে। অধিকাংশ লোকের অবস্থা এরূপ যে, সুযোগ পেলেই কখনো কাউকে নিয়ে উপহাস করে, কখনো বা তুচ্ছ কারণে কাউকে গালি-গালাজ শুরু করে৷ আবার কখনো কাউকে খারাপ নামে ডেকে তার সাথে মজা করে। আর এটা তো মজ্জাগত বদস্বভাব হয়ে গেছে যে, কারো

কোন ব্যাপারে সামান্য সন্দেহ হলেই নিশ্চিত হওয়া ছাড়াই তার ব্যাপারে খারাপ ধারণা করতে থাকে, নিজের দোষ-ত্রুটি সংশোধনের ব্যাপারে উদাসীন, অথচ অন্যের দোষত্রুটি খোঁজায় মহাব্যস্ত, আর কয়েকজন একত্রিত হলে তো কারো না কারো গীবত না করে তৃপ্তি নেই। এসব করা যে মহাপাপ এ অনুভূতিও অনেকের মাঝে নেই। অথচ এসব জঘন্য পাপকাজের দ্বারা পারস্পরিক ভালোবাসা নষ্ট হয় এবং পরস্পরের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি হয়। এর ফলে ঝগড়াবিবাদ শুরু হয় এবং সামাজিক শান্তিশৃঙ্খলা নষ্ট হয়। এসব জঘন্য পাপ থেকে যারা তাওবা করে না তাদেরকে আল্লাহ জালিম বলে ঘোষণা করেছেন। কারণ এসবের দ্বারা আল্লাহর নিরীহ বান্দাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়। আর কাউকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়া সুস্পষ্ট জুলুম। আর জুলুমের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ।

আল্লাহর ভয়াবহ শাস্তির কথা স্মরণ করে এসব জঘন্য পাপ থেকে বিরত থাকা মুসলমান হিসেবে আমাদের একান্ত কর্তব্য।

হে আল্লাহ! আমাদের সকলকে এসব জঘন্য পাপকাজ থেকে বিরত থাকার তাওফিক দান করুন। আল্লাহুম্মা আমীন!

.

.

.

[সংগ্রহ সূত্রঃ http://insaf24.com/news/44076]